পাঁশকুড়োনি কঙ্কাবতী

ওর নাম ছিল টিয়া। তবে সে নামটা চালু ছিল শুধু পাড়া-প্রতিবেশীদের মুখেই। বাড়িতে ওর দিদি অর্থাৎ পাকড়াশিগিন্নি ওকে সম্বোধন করতো খান্‌কি, পোড়ারমুখী, হারামজাদি, শয়তান, হতচ্ছাড়ি, নিমকহারাম ইত্যাকার মধুর সম্ভাষণে। পাকড়াশিবাবু বিদ্রুপ করে ডাকতেন বাদশাজাদি, নবাবকন্যে বলে।

বলতেন, "বলি ও নবাবকন্যে, দয়া করে একটু গতরখানা নড়াও। অফিসের দেরী হয়ে গেল যে। চারটি খেতে দেবে, নাকি বাসি মুখেই অফিস যাবো?"

আঁতুরঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে দিদি ঝঙ্কার দিয়ে উঠতো, "পই পই করে বল্লাম আগে উনোনে আগুন দিয়ে আয়, তা না সাত সকালে কাঁথার রাশ নিয়ে কাচতে বসা হ'ল। দেমাক দেখাচ্ছেন। পিটিয়ে লাশ বানিয়ে দেব না ! ওনার আর কি - দু'বেলা ভরপেট খাচ্ছেন, পটের বিবিটি হয়ে দিদি-ভগ্নিপোতের ঘাড়ে চেপে বসে রয়েছেন। এখন জ্বালা পোয়াও তোমরা ----।"

পাকড়াশিবাবুরা আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন। একেবারে গায়ে গায়ে বাড়ি। টিয়াদি প্রথম যখন এলো, তখন আমি খুবই ছোট। সবে স্কুলে ঢুকেছি। ভাসা ভাসা মনে আছে আজও। সুন্দর টুকটুকে, পরনে ডুরে শাড়ি, বছর বারোর মেয়েটি বিস্ময়ভরা লাজুক চোখে তাকিয়েছিল।

পাকড়াশি বউ মাকে বললো, "এটি আমার সবচেয়ে ছোট বোন মাসিমা। অন্যগুলোর বিয়ে হয়ে গেছে, এই একজনই বাকি এখন। তা ওদেশে এখন যা কাণ্ড চলছে, সোমত্ত কুমারী মেয়ে ঘরে রাখতে সাহস পেলো না বাবা মা। তাই পাঠিয়ে দিয়েছে। আমাদের গাঁ থেকে চেনা জানা অনেক চলে এসেছে কোলকাতায়, তাদের সঙ্গে পাঠিয়েছিল একে। আপনার জামাই গিয়ে নিয়ে এসেছে।"

পাকড়াশি বউয়ের তখন সবে দু'টি কোলে এসেছে, তৃতীয়টি তখনও পেটে। বোনকে রান্নাবান্না বাচ্চাধরার কাজ শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরী করে নিয়ে তার অপটু কচি ঘাড়ে সংসারের দায়দায়িত্ব তুলে দিয়ে আঁতুরে ঢুকলো। ঠিয়াদির ঘাড় আর কোনদিন দায়মুক্ত হয়নি এরপর। এমন কি পুনঃ পুনঃ আঁতুর প্রবেশের মাঝের বিরতিটুকুতেও পাকড়াশি বউ সংসারের ঝামেলায় আর জড়ায়নি নিজেকে। নিজের হৃত স্বাস্থ্য উদ্ধারের প্রচেষ্টাতেই কাটিয়েছে সময়টা। অবশ্য বোনের কাজকর্মের উপর কড়া নজর কোনদিনই শিথিল হ'তে দেয়নি তা বলে। পান থেকে চুনটি খসলেই রসনার চাবুক চালিয়ে আগাপাস্তালা ছাল ছাড়িয়ে নিয়েছে তার।

পাড়া প্রতিবেশীরা আড়ালে আক্ষেপ করতো টিয়াদিকে নিয়ে। এমন কি আমরা ছোটরাও গভীর সহানুভূতি অনুভব করতাম টিয়াদির জন্যে। কিন্তু সে সহানুভূতি সমবেদনার ক্ষমতা কতটুকু? তার উদয়াস্ত হাড়ভাঙা খাটুনি আর বাক্যজ্বালার যন্ত্রণা লাঘবের সাধ্য আমাদের ছিল না। বরং টিয়াদিকে যে সবাই স্নেহ মমতার দৃষ্টিতে দেখে এ তথ্য পাকড়াশি দম্পতির চোখে দিনে দিনে আরও চক্ষুশূল করে তুললো তাকে।

এরপর অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। স্কুলের গণ্ডি পার হয়ে কলেজে ঢুকেছি আমি। বাবা রিটায়ার করেছেন। পাকড়াশিবাবুর মাথাজোড়া টাক এখন। পাকড়াশি বউ মেদের ভারে নড়া চড়া করতে পারে না। শুধু টিয়াদির জীবনেই বুঝি কোন পরিবর্তন আসেনি। ভোরের আলো ফোটার আগে ঘুম থেকে উঠে ডিউটি সুরু হয়ে যায় তার। কয়লা ভেঙে উনোন ধরানো, বাসন মাজা, চা জলখাবার তৈরী করা। তারপর উনোনে কয়লা দিয়ে কিংবা ডাল চাপিয়ে সেই ফাঁকে ঝাঁটপাট, কাঁথা কাপড়ের ডাং কাচা। এত অযত্ন অনাদার সত্বেও দেহখানি ঘিরে তেমনি অপরূপ লাবন্যশ্রী। শুধু ডাগর দু'চোখে লাজুক বিস্ময়ের বদলে শঙ্কিত বিষণ্ণতা।

এমনি সময়ের কথা। টিয়াদি বাড়ির বাইরে যেতো কচিৎ কদাচিৎ। নেহাত কোন কাজ পড়লে পাকড়াশি বউ পাঠাতো তাকে, এটা ওটা সেটা চাইতে। সেদিনও তেমনি কি একটা প্রয়োজনে এসেছিল টিয়াদি।

আমি বারান্দায় একা বসে পড়ছিলাম। মা কলঘরে স্নান করছিলেন। ম ায়ের কাছেই কোন কাজে এসেছিল দিদির নিদর্শমত।

একটা মোড়া এগিয়ে দিয়ে বললাম, "বোস না টিয়াদি, মা এক্ষুনি এসে যাবে।"

টিয়াদি সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। খানিকক্ষণ উসখুস করে হঠাৎ বললো, "হ্যাঁরে বুলা, তোর বড়দার সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে না, না রে?"

আচমকা এই উদ্ভট প্রশ্নে অবাক হয়ে টিয়াদির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বড় করুণ, বড় বিষণ্ন দেখাচ্ছিল টিয়াদিকে। অন্য সময়ের চেয়েও ঢের বেশী শুকনো শঙ্কিত মুখখানা।

আমার বড়দা পুণায় ডাক্তারী পড়ে তখন। বছরে একবার আসে শুধু। মাত্র কয়েক সপ্তাহের ছুটিতে। ভারী গম্ভীর, অমিশুক টাইপের ছেলে বড়দা। সে কি ওই অল্পদিনের ছুটিতে বাড়ি এসে টিয়াদির সঙ্গে প্রেম-ট্রেম কিছু করে গেছে? তা কি করে সম্ভব?

টিয়াদি সকরুণ গলায় আবার বললো, "তোদের মত লেখাপড়াও তো শিখিনি। গ্রামে থাকতে যেটুকু জানতাম, তাও কবে ভুলে গেছি। জামাইবাবুকে কত বললাম স্কুলে ভর্তি করে দিতে। অন্ততঃ বাড়িতেও যদি পড়তে দিতো। ম্যাট্রিকটা কোনমতে পাশ করতে পারলে নিজের ভাত কাপড়টা জোটাতে পারতাম। আমার যে কোন পথ নেইরে!"

টিয়াদির দু'চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে কয়েক ফোঁটা জল পড়লো।

ক্ষিপ্রহাতে আঁচল দিয়ে সেটা মুছে টিয়াদি অপ্রস্তুত গলায় বললো, "দাঁড়া, ডালটা নেড়ে দিয়ে আসি। নইলে ধরে যাবে।"

এর কিছুদিন পরেই আমি পাটনায় পড়তে যাই। ছুটি ছাটাতে বাড়ি এলে টিয়াদিকে দেখেছি শুকনো মুখে যন্ত্রের মত একটার পর একটা কাজ করে যাচ্ছে, দিদি জামাইবাবুর অজস্র গালিগালাজ শাপ-শাপান্ত সহ্য করে। থার্ড ইয়ারের মাঝামাঝি পড়াশোনায় ইতি দিয়ে বিয়ে করে শ্বশুর ঘর করতে গেলাম। কোলকাতায়। তারপর ননদের বিয়ে, শাশুড়ির পক্ষাঘাত, নিজের শারীরিক অসুবিধা - এইসব নানা কারণে বাড়ি যাওয়া স্থগিত হ'তে হ'তে বছর দুয়েক কেটে গেল। মা'র চিঠিতে অবশ্য ওখানকার খবরাখবর পাই নিয়মিত। পাকড়াশি গিন্নীর মৃত্যুসংবাদ

চিঠির মাধ্যমেই জানতে পারি। এই বয়সে আবার মাতৃত্বের টানাপোড়েন নাকি সহ্য হ'ল না তার। তবে বাচ্চাটা বেঁচেছে।

আরও কয়েক মাস বাদে ধানবাদ যাওয়ার সুযোগ ঘটলো। বাড়ি পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। পথ যেন আর ফুরোতে চায় না। ধানবাদ। আমার জন্মভূমি। আমার শৈশব ও কৈশোরের প্রায় সমস্তটাই কেটেছে

এখানে। এখানকার পথঘাট, গাছপালা, বাড়িঘর - সবকিছু চিরপরিচিত অতি আপনার আত্মীয় বন্ধু যেন। এতদিনের অদর্শনেও এতটুকু অপরিচয়ের রেশ নেই কোথাও। সকালে উঠে ঘুমচোখে মায়ের হাত থেকে চায়ের কাপ নিতে নিতে শুনতে পেলাম পাশেরবাড়ির কয়লা ভাঙার আওয়াজ।

বললাম, "টিয়াদির ডিউটি শুরু হয়ে গেল না মা?"

মা অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, "হুঁ।"

আমি চায়ে চুমুক দিয়ে হালকা গলায় বললাম, "টিয়াদির জন্যে একটা ব্লাউজ এনেছি। দুপুরের দিকে গিয়ে দিয়ে আসবো'খন।"

মা উদাস গলায় বললেন, "এনেছিস যখন দিয়ে আসিস। তবে মানুষের কপাল কেউ খণ্ডাতে পারে না। মেয়েটার কপাল খানাই খারাপ। আহা, বাপ-মায়ে গুণ্ডার ভয়ে কচি মেয়েটাকে এত দূরে পাঠিয়েছিল। ভেবেছিল নিজের মায়ের পেটের বোন, বাপের তুল্য জামাইবাবু, কত আদর যত্ন করে রাখবে। এর থেকে পদ্মার জলে ভাসিয়ে দিলে বরং মেয়েটা নিষ্কৃতি পেতো। গুণ্ডারাও বুঝি এমন পাষণ্ড হয় না ----।"

ব্লাউজটা দিতে যাওয়া হয়নি শেষ পর্যন্ত। তবে টিয়াদিকে দেখেছি। গায়ে গায়ে বাড়ি। এ বাড়ি ও বাড়ির মধ্যে অন্তরাল খুব কম। দেখলাম টিয়াদি সিঁথিতে সিঁদুর পরে শাঁখা পরা শীর্ণ হাতে কাঁথা কাপড়ের ডাং কাচছে, বাসন মাজছে, তালপাতার পাখা দিয়ে প্রাণপনে উনুন হাঁকাচ্ছে।

আর পিছন থেকে পাকড়াশিবাবু সমানে তর্জন করছেন, "বলি গতরখানা একটু নড়াও। স্বামীর অফিসের ভাতটা সময়মত নামাতে কি গায়ে ফোস্কা পড়ে যায় নবাবজাদির? এই অফিসের দৌলতেই দু'বেলা গণ্ডে পিণ্ডে গিলতে পাচ্ছো, সে খেয়াল আছে?"